বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার মুখপত্র

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন,
জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭৭

দাম : ৫০ পয়সা

● ভারতীয় বিজ্ঞান : নীতি প্রণয়নে ও রূপায়ণে—২ ● ভারতবর্ষ : জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাচিত্র—৮

● রিপোর্ট : পশ্চিমবংগ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্মেলন—১৪

সম্পাদকীয়

একথা আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত যে ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছেনা। বিজ্ঞান গবেষণা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকর্মীরা প্রতিদিন নানা জটিল ও অস্বস্তিকর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে সমাজজীবনের অন্যান্য সংকট ও সমস্যার সাথে বিজ্ঞান সমস্যার যোগসূত্রটিও ক্রমশঃ তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অনেকেই তাই অনুভব করছেন যে সমাজের প্রতিটি সমস্যাক্লিষ্ট অংশের সাথে সংগঠিত উদ্যোগ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া তাঁদের কোন সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব নয়। অতীতের আবছা ধারণা এখন অবস্থা ও অভিজ্ঞতার চাপে ধীরে ধীরে বিশ্বাসে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর, বিশ্বাস থেকেই আসছে সাধ্যানুযায়ী কর্মপ্রয়াস—ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা যাচ্ছে নানা নতুন উদ্যম এবং কিছু কিছু গোষ্ঠী বা সংস্থার অভ্যুদয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রায় দু' বছর-ব্যাপী অনুরূপ একটি অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টারই সফল পরিণতি। বিজ্ঞানকর্মীদের একটি অংশের দীর্ঘঅনুভূত প্রয়োজনবোধের মধ্যেই সংস্থার জন্ম। নতুন পত্রিকা হ'ল সর্বস্তরের বিজ্ঞানকর্মীদের মতামত বিনিময়ের একটি মঞ্চ—আলোচনা-সমালোচনার ভেতর দিয়ে সকলের মতামতকে আরো স্পষ্ট-সংহত-শাণিত ও পরস্পরগ্রাহ্য ক'রে তোলাই পত্রিকার লক্ষ্য। বিজ্ঞানকে সামাজিক প্রগতিতে ব্যবহারের সঠিক অভিমুখ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও পত্রিকা চেষ্টা চালিয়ে যেতে চায়।

বাংলা বা অন্য ভাষায় অনুরূপ উদ্দেশ্যমুখী ও প্রায়-সমমনোভাবাপন্ন আরো কিছু পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত—তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার কোন অভিপ্রায়ই আমাদের নেই। বরং বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে চাই। সৎ-সঠিক উদ্দেশ্য ও সুস্থ মনোভাব থাকলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পরস্পরের পরিপূরক হ'তে বাধ্য। একমাত্র তাহলেই সমস্ত আলোচনাকে একটি সুসংগঠিত রূপ দিতে আমরা সক্ষম হবো ; যার ওপর ভিত্তি ক'রে ভবিষ্যতে দেশময় একটা সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে।

আমাদের চারপাশে আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিমুখর বাতাস—সরব বৃহত্তর জাতীয় পরিবেশ। স্বৈরাচারিতাকে প্রতিহত ও প্রতিস্থাপিত ক'রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুধু দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না—সমাজ সংলগ্ন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেও তা সঞ্চারিত হতে বাধ্য। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির চৌহদ্দির ভেতরে ও বাইরে, সাধ্যানুযায়ী, সেই বাঞ্ছিত গণতন্ত্রীকরণের সংগ্রামে সাথী ও শরিক হ'তে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাছাড়া, যে কোন ন্যায়সংগত সংগ্রামের স্বপক্ষেও আমরা সবসময়ই সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাই।

"আলোচনা অনেক হয়েছে—অতএব আর নয়"—এরকম মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতে আমাদের অবস্থান। আমরা বরং আরো গভীর, মনোজ্ঞ ও ব্যাপক আলোচনারই পক্ষপাতী (তবু "শুধু আলোচনার জন্য আলোচনা" বা নিষ্কর্ম আলোচনার নিস্ফলতা সম্পর্কেও আমরা সম্পূর্ণ সচেতন)। ভারতীয় বিজ্ঞাননীতির মূল্যায়ণ সম্পর্কিত একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমরা পত্রিকার উদ্বোধন করছি—বিষয়টিকে আংশিক সুনির্দ্দিষ্টতা দেবার জন্য জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়েছে। উত্থাপিত বিষয় দুটি সম্পর্কে বিশদতর গভীরতর আলোচনা-সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করছি—বিষয়সূচীর পারম্পর্য্য ও আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার দিকে আমরা যথাসম্ভব মনোযোগী হ'তে চেষ্টা ক'রবো। তবে অজস্র সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পত্রিকার উন্নতমান বা নিয়মিত প্রকাশ সম্পর্কে এখনই কোন প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি না ; আর দেওয়া বোধ হয় সমীচীনও নয়।

পরিশেষে, শুধু এই আশা যে প্রকাশকদের প্রগাঢ় ইচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা, আর পাঠকবর্গ-তথা-বিজ্ঞানকর্মীবন্ধুদের সক্রিয় সমর্থন ও সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার ভিত্তিতে সব বাধা ডিঙিয়ে আমরা শেষপর্য্যন্ত একসাথে এগিয়ে যেতে পারবো।

ভারতীয় বিজ্ঞান ঃ নীতি প্রণয়নে ও রূপায়ণে

সুদূর অতীতে বিজ্ঞানচর্চা ও চেতনার অন্যতম পীঠস্থান ছিল ভারতবর্ষ — চরক-সুশ্রুত-আর্যভট্ট-ভাস্করাচার্যের সে যুগ বিগত হ'য়েছে বহুদিন। আরও আধুনিক কালে, এই সেদিনও, জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র, রমন, রামানুজন, ভাবা, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রমুখ বিজ্ঞান-নায়কেরা সৃষ্টি করেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানের আর এক অধ্যায়, আর এক যুগ। আজ বুঝি বা সে যুগও যেতে ব'সেছে ইতিহাসের যাদুঘরে। পুরানো দিনের বিজ্ঞানচর্চার ধারা আজ আমাদের চোখের সামনেই দিন দিন আমূল পাল্টে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের নতুন সংগঠন, নতুন সম্ভাবনা, নতুন দিশা।

ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা, ব্যক্তিবিশেষের নিভৃত সত্যান্বেষণের ফলশ্রুতি থেকে বিজ্ঞান আজ উন্নীত হতে চ'লেছে সমগ্র সমাজের সংগঠিত প্রয়াসে। ভারতীয় বিজ্ঞানের যে সব গৌরবময় যুগ তাই বিগত হয়েছে বা হ'তে ব'সেছে, তা বোধ হয় ইতিহাসের বিধান মেনেই। কিন্তু আজ যখন ভারতীয় বিজ্ঞানের অবস্থান সম্মুখের এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে, একই সাথে তখন এর মধ্যে প্রকট হ'য়ে উঠেছে উদ্দেশ্যহীনতা, সমাজ-বিচ্ছিন্নতা আর মানসিক দৈন্য। দেশের অগণিত মানুষের সৃজনীশক্তিকে সম্পদ করে এগিয়ে চলার বদলে বিজ্ঞান ব'য়ে নিয়ে চ'লেছে পরমুখা-পেক্ষিতার গ্লানি। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতবর্ষের মতো বহু দেশেই আজ আলোচনা আর অনুসন্ধান চ'লছে বিজ্ঞানের এহেন বিপর্যয় আর দৈন্যের কারণটিকে ঘিরে। সারা পৃথিবী জুড়েই বিতর্ক চ'লছে শুধু আগামী দিনের বিজ্ঞানের বিজ্ঞানগত অন্তর্বস্তুটি নিয়েই নয়, তার সামাজিক ভিত্তি, তার গতিপ্রকৃতি নিয়েও। প্রশ্ন উঠেছে, বিজ্ঞান যে আজ সর্বত্রই সংগঠিত হ'চ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে, সে সংগঠন পুরো সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বসর্তগুলো কি? কি অবস্থায় এই সংগঠন ব্যবহৃত হয় সমাজের গরিষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে, একচেটিয়া শক্তির স্বার্থসিদ্ধির কাজে, আর কখনই বা তা যুক্ত হ'তে পারে সমগ্র সমাজের সুসমঞ্জস বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারার সাথে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই প্রশ্ন, এই বিতর্ক আরও ব্যাপক, আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছে। পৃথিবীজোড়া এই আলোচনা আর বিতর্কের পটভূমিকায় এদেশে আজ রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে শুরু ক'রে সমাজের সব স্তরেরই অগণিত মানুষের মনে বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের তথা সমাজের সাথে বিজ্ঞানের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের প্রশ্নটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হ'লেও, ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ ক'রছে। তাই আজ বিজ্ঞানকর্মীদের কর্তব্য এই প্রশ্নের বাঞ্ছিত সমাধানের দিকে তাঁদের উৎসাহ, কর্মশক্তি ও মেধা সঞ্চালিত করা। স্বভাবতঃই, এই কর্তব্য দাবী করে এদেশে বিজ্ঞানসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের বিভিন্ন দিক নিয়ে যুক্তিনির্ভর আলোচনা ও বিশ্লেষণ। এ ধরণের বিশ্লেষণ এর আগে অবশ্যই হ'য়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা এখনও যথেষ্ট নয়, আর জনমানসে তা এখনও সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে নি। এ কাজে সহায়তার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত।

ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপট

একথা অনস্বীকার্য যে উনিশ-শ' সাতচল্লিশের পর এদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে—সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে উচ্চতর বৃত্তিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান কর্মীদের, এবং প্রতিষ্ঠা তথা প্রসার ঘটেছে বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞানগবেষণাকেন্দ্রের। মোট পরিমাণের বিচারে দেখা যাবে বিনিয়োগের অঙ্ক নেহাৎ কম তো নয়ই, বরং বলা উচিত, বেশ একটা বড় কাঠামোই সৃষ্টি হ'য়েছে বিজ্ঞানের। উচ্চবৃত্তিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানকর্মী আর ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যার দিক থেকে ভারতের স্থান আমেরিকা আর রাশিয়ার পরেই।[১] প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ মোট বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী কর্মীর সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল প্রায় দুই লক্ষ—আর ১৯৭০ সালে তা স্ফীততর হয় প্রায় বারো লক্ষে।[২] বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণায় কেন্দ্র, রাজ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিনিয়োগ ১৯৫৮-৫৯ সালে ছিল ২৯ কোটি টাকা (মোট জাতীয় উৎপাদনের ০·২৩%)—১৯৭০-৭১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৭৩ কোটি টাকায় (মোট জাতীয় উৎপাদনের ০·৪৮%)।[৩] আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে এই পরিমাণ বিনিয়োগ যথেষ্ট না হ'লেও নিশ্চয়ই নগণ্য নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—বিনিময়ে বিজ্ঞান কি দিয়েছে দেশের সাধারণ মানুষকে, কতখানি কাজে লেগেছে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশে, কি ভূমিকা পালন করেছে জনসাধারণের বিজ্ঞানচেতনার মানোন্নয়নে? 'কিছুই ফল হয় নি'—এ কথা নিশ্চয় সত্য নয়। তবে অনেকেই স্বীকার করবেন যে, যা হ'য়েছে তা প্রয়োজন ও সম্ভাবনার তুলনায় যথেষ্ট অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু কেন? তবে কি এদেশের নীতিনির্ধারক সারথিরা, দেশের অর্থনীতি ও বিজ্ঞান-

সংক্রান্ত পরিকল্পনার রচয়িতা তথা রূপকারেরা, কোথাও একটা বড় রকমের ভুল ক'রে ফেলে ছিলেন? নাকি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁরা সমাজের যে অংশের ছাপ, যে অংশের চিন্তা বহন ক'রে এসেছেন তা হ'য়েছে বস্তুগত ভাবেই সামগ্রিক বিকাশের পরিপন্থী? এসব প্রশ্ন কিন্তু আজ নতুন নয়। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা তর্ক-বিতর্ক আন্দোলন কম হয় নি। বিজ্ঞানীরা পিছপা হননি সংগঠিত প্রয়াসে সামিল হ'তেও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এসব সত্ত্বেও স্থাপিত হয়নি সমাজের সাথে বিজ্ঞানের ঈপ্সিত নিবিড় যোগসূত্রটি। ফলে সাধারণ বিজ্ঞানীরা আজ গভীর নৈরাশ্যের স্বীকার। যা কিছু ঘটে চলেছে তাকেই অমোঘ অলঙ্ঘ্য হিসাবে মেনে নেওয়ার ক্ষতিকর প্রবণতা ছড়িয়ে প'ড়ছে তাঁদের চেতনার গভীরে। এই হ'লো ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটের এক দিক—বিজ্ঞানের এক বিশেষ ধরণের কাঠামোর প্রসার, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এই কাঠামোর ব্যর্থ ভূমিকা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিবাদ তথা প্রয়াস সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা, আর এরই ফলশ্রুতি হিসাবে এক নিস্পৃহ নৈরাশ্যের আবহাওয়া। আবার এরই সাথে র'য়েছে আরেক দিক—বিজ্ঞানের নতুন সম্ভাবনা, বিজ্ঞানের কাছে মানুষের আশা, মানুষের দাবী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রত্যয়ের সাথে বিজ্ঞানকে সমাজের গরিষ্ঠ মানুষের অগ্রগতির সহায়ক ক'রে তোলার প্রয়াস। এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবে নির্ধারিত হ'তে চলেছে ভারতীয় বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি।

বিজ্ঞাননীতির বিকাশ : রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় বিজ্ঞান :

আজ নয়, বৃটিশ শাসনের সময় থেকেই শুরু হ'য়েছে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের সাংগঠনিক রূপ, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশে বিজ্ঞানের ভূমিকা, বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তিকরণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা। বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও আন্দোলনের প্রসারের সাথে সাথে দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা ও বিজ্ঞানীদের চিন্তায় বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকার প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে শুরু করে। একদিকে মানবেন্দ্রনাথ রায়, গান্ধী, নেহেরুর মতো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের, অন্যদিকে প্রফুল্লচন্দ্র, বিশ্বেশ্বরায়া, মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীদের চিন্তায় বিষয়টির গুরুত্ব নানাভাবে স্বীকৃত ও প্রকাশিত হ'তে থাকে। অবশ্য একথা ঠিক, যে এক এক জনের দৃষ্টিতে সমাজের ঈপ্সিত গতিধারার রূপটা ছিল এক এক রকম। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে তখন থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে বিতর্ক আর সংঘাত চলে আসছে সমাজতন্ত্র বনাম ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা পুঁজির ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজব্যবস্থার। অনুন্নত দেশগুলোতে বিতর্ক ও বিবাদ-বিসম্বাদের মূল বিষয় ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উন্নত দেশগুলোর সাহায্যনির্ভর হ'য়ে অর্থনৈতিক বিকাশ ও আধুনিকীকরণ, না দেশজ সম্পদ ও দেশজ মানুষের শ্রম ও সৃজনশক্তির ওপর নির্ভর করে বিলম্বিত অথচ সর্বাঙ্গীন বিকাশ। এবং বিতর্কের এই দুই বিপরীতমুখী ধারাই তখন প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে বিজ্ঞানব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গীকেও। অন্যদিকে, ভারতের অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার স্তরে নিয়ে আসার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারও তার শাসনের শেষভাগে সচেতন ও তৎপর হয়েছে, উপলব্ধি ক'রেছে পরিকল্পনায় বিজ্ঞান-ব্যবহারের প্রয়োজনীয় দিকটি—ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর আলোকপাতের জন্য ইংলণ্ড থেকে নিয়ে এসেছে পর্যবেক্ষক-বিশেষজ্ঞদের[৪]। আর, ইতিহাসের এক বহু আলোচিত প্রহসন হিসাবে, সাতচল্লিশোত্তর যুগে যে পরিকল্পনা এদেশে গৃহীত হয়েছে তার অনেকটাই প্রতিধ্বনিত করেছে বৃটিশ পরিকল্পনার ধারাকে। যাই হোক, যে স্বার্থের বশেই হোক, বিগত কয়েক দশকে এটা ক্রমশঃ সাধারণগ্রাহ্য সত্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে যে বিজ্ঞানকে সচেতনভাবে সমাজবিকাশের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে হবে—এটা অবশ্যই পুরোনো দিনের চিরাচরিত ধ্যানধারণার থেকে একটা নির্দিষ্ট উত্তরণের উপক্রমণিকা। এরই ফলশ্রুতি বোধহয় ১৯৫৮ সালে গৃহীত ভারত সরকারের বিজ্ঞাননীতি-বিষয়ক প্রস্তাব—যার বিশদ আলোচনা-সমালোচনার অবকাশ এ প্রবন্ধে নেই। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দুঃখজনকভাবে স্বীকার্য শুধু এইটুকুই যে এই পদক্ষেপ ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে নি। এই অসাফল্যের দিকটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের বিজ্ঞানীসম্মেলনে প্রদত্ত ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণে, তিনি বলেছিলেন: "তাঁরই (পণ্ডিত নেহেরুর) অনুপ্রেরণায় সরকার ১৯৫৮ সালের বিজ্ঞাননীতিবিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারপর আমরা আর এগোই নি।" অত্যন্ত অস্বচ্ছ আর আর ভাসাভাসাভাবে এই প্রস্তাব দেশের একটা সমস্যাকে তুলে ধরেছিল, কিন্তু একটা বিশাল দেশের উন্নতিকামী মানুষের সফল পথপ্রদর্শক হওয়ার মতো উপযুক্ত সুনির্দিষ্টতা ছিল সেখানে অনুপস্থিত। ফলে জাতির জীবনে কোন কার্যকর ভূমিকা পালনে সে দলিল সক্ষম হ'লো না—কিছু বেহিসাবী বিনিয়োগ আর কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপন ভিন্ন কোনও সার্থক লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হলো না—বিজ্ঞানের বাঞ্ছিত জাতীয় চরিত্র অনর্জিত রয়ে গেল, কোনও গঠনমূলক উদ্দেশ্যবোধে অনুপ্রাণিত হলেন না দেশের বিজ্ঞানীরা। প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতার উদাহরণ হিসাবে দুটি বিষয় শুধু এখানে উল্লেখ করা যায়। দলিলের শুরুতেই বলা হয়েছে যে জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি হ'লো "কারিগরী (Technology), কাঁচামাল (Raw materials) আর পুঁজি (Capital)", এই তিনের "কার্যকরী সমন্বয়"; অবশ্য এ ছাড়া আছে জনসাধারণের "ইচ্ছাশক্তি (Spirit)"। এ কি শুধুই ভ্রম? পুঁজি হ'লো চাবিকাঠি, আর জনসাধারণের ভূমিকা নির্দিষ্ট হ'লো কেবল তাঁদের ইচ্ছাশক্তি বা প্রেরণার স্তরে? কোথায় গেল তাঁদের শ্রম

আর সৃজনীশক্তি, যার ওপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়াবে বিজ্ঞান তথা সভ্যতা? কেন উহ্য রয়ে গেল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টির পদ্ধতির কথা? এ সমালোচনা হ'তো নিছক তর্কবিলাস, যদি না এটা হ'তো ভারতের সর্বোচ্চ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত নীতির গোড়ার বক্তব্য[৫]। তারপর

> কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত বনাম বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক জাতীয় কমিটির (N C S T) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
>
> (নিচের উদ্ধৃতি ও মন্তব্যগুলো সায়েন্স টু-ডে পত্রিকার জানুয়ারী, ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত এ. কে. এন রেড্ডির প্রবন্ধ 'ইজ ইণ্ডিয়ান সায়েন্স ট্রুলি ইণ্ডিয়ান?' থেকে নেওয়া; পাঠককে প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।)
>
> "....(পরিকল্পনা কমিশনের 'অ্যাপ্রোচ টু ফিফ্‌থ প্ল্যান' অনুসারে) 'মাঝারি ও উচ্চ আয়বিশিষ্ট স্তরগুলোর তুলনায় নিম্ন আয়বিশিষ্ট স্তরটার ব্যবহার্য বস্তু সামগ্রীতে আমদানিজাত জিনিস-পত্রের অংশ খুবই কম।....দরিদ্রদের অনুকূলে ভোগক্ষমতার পুন-র্বণ্টনের দরুণ তাই বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি হ'তে বাধ্য। সুষম বণ্টন আর অধিকতর স্বনির্ভরতা.....পরস্পরের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।'
>
> "অর্থাৎ (পরিকল্পনা কমিশনের মতে) 'বৈষম্য হ্রাস আর স্বনির্ভরতার মধ্যে পারস্পারিক কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে', এবং সত্যিকারের স্বনির্ভরতার উপায় হলো বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে (অর্থনৈতিক) বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং যদি ভারতের বিজ্ঞান আর কারিগরীকে জাতীয় স্বনির্ভরতার লক্ষ্যের সহায়ক ক'রতে হয় তবে তাদেরকে যেভাবেই হোক বৈষম্য হ্রাসের দিকে চালিত করতে হবে।"
>
> "(জাতীয় কমিটির বিজ্ঞানবিষয়ক পরিকল্পনার ব্যাপারে) একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এই যে, N C S T তার বিভিন্ন সাব-কমিটিগুলোকে এরকম কোনই নির্দেশ দেয়নি যাতে এমন ধরণের কারিগরীর ওপর জোর দেওয়া হয় যেগুলো কিছু লোকের স্বল্প-কালীন স্বার্থসিদ্ধির বদলে বহু মানুষের দীর্ঘকালীন প্রয়োজন মেটাবে। এমনকি N C S T এর দলিলে 'সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ' শীর্ষক অংশেও আয়ের বৈষম্য হ্রাসের সহায়ক কারিগরী-গুলোর কোনই উল্লেখ নেই।"

ধরা যাক প্রস্তাবের প্রথম সুপারিশটার কথা। বলা হচ্ছে, বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সর্বক্ষেত্রে—যথা বিশুদ্ধ (Pure), প্রযুক্তিগত (Applied), আর শিক্ষাগত (Educational) এই তিন দিকেই। এখানে আবার লক্ষ্যণীয় নীতিগুলোকে সুশ্রাব্য আর সাধারণীকৃত রূপে পেশ ক'রে নির্দিষ্ট সমস্যার নির্দিষ্ট সমাধান এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা। একটা উন্নতিকামী দেশের পক্ষে তিনটে দিকের ওপর একইসাথে সমান গুরুত্ব আরোপ কি সম্ভব? অগ্রাধিকারের প্রসঙ্গটিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ কই? এই স্পষ্টতার অভাবে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হ'য়েছে কত না বিভ্রান্তি, কত না বাদানুবাদ, কত না অপচয়।

বহু ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৮ সালের দলিলটি পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর থেকে বিজ্ঞানকে ক্রমশঃ বেশী করে জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করার চেষ্টা চলেছে। ১৯৬৩ সালে প্রখ্যাত দেশীয় বিজ্ঞানী আর শিক্ষাবিদদের নিয়ে অধিবেশন বসেছে, স্থাপিত হয়েছে বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, রচিত হয়েছে ১৯৭৪-৭৯ সালের জন্য বিজ্ঞানের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা[৬]। অতীতের তুলনায় এই পরিকল্পনার রূপরেখা অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট কিন্তু তবুও সুসম্পূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় সেই একই দৃষ্টিভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি। বলা হয়েছে যে পরিকল্পনার মূল উপাদান তিনটি: সম্পদ, কারিগরী আর ব্যবস্থাপনা (Management)। দেশজ মানুষের শ্রম ও সৃজনীশক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের কথা আবারও বাদ! বলা হয়েছে "বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের ধারা ও পদ্ধতির গণতন্ত্রীকরণ আর বিকেন্দ্রী'-করণের প্রশ্নটি আর নতুন করে গুরুত্ব পাওয়ার অপেক্ষা রাখে না।" কিন্তু কিভাবে সুসম্পন্ন হবে সেই বাঞ্ছিত গণতন্ত্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের কাজটি? নিশ্চয় শুধুমাত্র কতকগুলো সঙ্কল্প গ্রহণ ও প্রস্তাব রচনার মাধ্যমে নয়? কতকগুলি ব্যবস্থাপক কমিটি নিয়োগ ও ওপর ওপর কিছু কাঠামো পরিবর্তনের দ্বারাও তা হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ চেষ্টা চলছে অনেকটা সেই ধরনেরই। তাই দেখা যাচ্ছে এত ব্যবস্থাপক কমিটি নিয়োগ, এত ধরনের কাঠামো সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বৈরতন্ত্র। প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকমণ্ডলী সমাজের কোন অংশের ছাপ বহন করলে এটা সম্ভব? এ সব প্রশ্নের কোনও উল্লেখ নেই, নেই তার সমাধানের কোনও ইঙ্গিত।

ভারতীয় বিজ্ঞানের সাংগঠনিক কাঠামো—প্রতিষ্ঠানগত দিক:

যেমন অন্য সব বিষয়ে তেমনি বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রেও নীতি প্রণয়নটাই শেষ কথা নয়—নীতিরূপায়ণই হলো আসল এবং অনেক দুরূহ কাজ। সেখানে আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সাফল্য কতটা তার নিরিখেই যাচাই হবে নীতি প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ও বাস্তব চরিত্র—শুধু কথার ওজনে কখনোই নয়।

আলোচনা আর অনুধাবনের সুবিধার্থে বিজ্ঞাননীতির প্রয়োগের দিকটাকে আমরা তিনটে স্তরে ভাগ করতে পারি—প্রতিষ্ঠানগত স্তর, মাধ্যমিক স্তর আর জাতীয় স্তর[৭]। প্রথম স্তরের পরিধির মধ্যে পড়ে বিজ্ঞান আর কারিগরী চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় উৎপাদনের সমন্বয় ও সংযোগসাধন দ্বিতীয় স্তরের পর্যায়ভুক্ত। আর বিজ্ঞান ও কারিগরীচর্চা

প্রস্তুত ফসলকে জাতীয় স্বার্থ তথা জাতীয় উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের দিকটি তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য একথা ঠিক যে কোনও স্পষ্ট বিভাজনরেখা দিয়ে বিভিন্ন স্তরগুলোকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা যায় না—এদের যোগাযোগ অতি নিবিড় হওয়া প্রয়োজন, যদিও এই যোগাযোগ এদেশে অনেকটাই অনুপস্থিত।

বিজ্ঞান ও কারিগরীর চর্চার নামে এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধনের উদ্দেশ্যে এদেশে গত তিন দশকে স্থাপিত হয়েছে অসংখ্য কমিটি ও প্রতিষ্ঠান—এবং এখনও তা হয়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত ১৯৬৯-৭০ সালের সরকারী বাৎসরিক রিপোর্ট অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় সংস্থাগুলির তালিকা হলো: CSIR অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান—৩৪, শিল্পভিত্তিক গবেষণাসংস্থা—১১, প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট সংস্থা ৩৪, ICAR অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান—২৪, ICMR অধীনস্থ সংস্থা—৪, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান—৪, UGC অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়—৭৯, বিশ্ববিদ্যালয়তুল্য প্রতিষ্ঠান —১০, উচ্চতর অধ্যয়ন কেন্দ্র—১৭, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান—৫৭।[২] তাছাড়া কৃষিগবেষণা কেন্দ্রগুলোর মোট শাখাও হবে অন্যূন ৩০০ (১৯৬৫ সালের হিসাব অনুযায়ী)[৮]। এতো গেল প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা। তাছাড়া রয়েছে অসংখ্য কমিটি, কমিশন ও বিভাগীয় সংগঠন। সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক জটিল বহু স্তরবিশিষ্ট কাঠামো [এই কাঠামোর বিশদ বিবরণ আর কার্যপ্রণালী পাওয়া যাবে (৪) ও (৯) নং সূত্র থেকে]। এখন, এত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, সংস্থা আর কমিটি সত্ত্বেও বিজ্ঞানের অবদান জাতীয় জীবনে প্রায় শূণ্য—এ দেখে অনেকের ধারণা যে প্রতিষ্ঠানগত তথা সাংগঠনিক দিকটাই বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানের ওপর শৃঙ্খল হয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রয়োগকে বাধা দিচ্ছে। এটা মেনে নেওয়ার অর্থ কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক সমাজের একটা মূল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আধুনিক সমাজের অগ্রগতি ঐতিহাসিকভাবে দাবী করে এক বৃহৎ সংগঠনগত প্রচেষ্টা যেটাকে বাদ দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানও এগুতে পারে না। কিন্তু সংগঠনই চূড়ান্ত ও একমাত্র দিক নয়। বৃহত্তর জনসাধারণের প্রয়োজন, তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, যদি সংগঠনের ভিত্তি না হয় তবে সে সংগঠন প্রতিবন্ধকে পর্যবসিত না হয়ে পারে না। সংগঠন সফলভাবে সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে যেমন বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটাতে পারে, তেমনই হয়ে উঠতে পারে অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা যদি তা ব্যবহৃত হয় সমাজের বিরোধী শক্তিগুলোর দ্বারা। ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক সংগঠনে এ দুইয়ের কোন্ দিকের প্রাধান্য, কোনও কূটতর্ক, কোনও সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে তার মীমাংসা সম্ভব নয়—তা সম্ভব দেশীয় বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার রায় থেকে। এখানে আমরা বিচারকের আসনে সমাসীন নই—শেষ বিচারের স্থানও এটি নয়। তবু উল্লেখ্য শুধু এই যে পরিকল্পনা ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গত ত্রিশ বছরে দেশের মানুষ শুনেছে যত গালভরা কথা, পরিকল্পনা-বিশারদদের কাছ থেকে তার সাথে পায় নি মানুষ আর সংগঠনের যোগাযোগ সম্পর্কে কোনও সুস্থ দিকনির্দেশ। কেন? এর উত্তর শুধু বিজ্ঞানেরই নয় এদেশের সমাজতত্ত্বেরও বিচার্য বিষয়।

ভারতীয় বিজ্ঞানের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রথম স্তর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানগত স্তর নিয়ে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজকর্মের সমস্যা ও কর্মরত বিজ্ঞানীদের মানসিকতা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ বিজ্ঞান ও কারিগরীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাইকেই এই স্তরের মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে সমস্যাগুলো হলো প্রধানতঃ—প্রতিষ্ঠানগুলোর আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব, প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সংকীর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বার্থের নিয়ন্ত্রণ, বিদেশী বিজ্ঞান আর কারিগরীর ওপর চরম নির্ভরতা, বিজ্ঞানীদের ধ্যানধারণায় নানা পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা ও দর্শনের কুপ্রভাব, ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলোর প্রকৃতি এমন যে এগুলোর আক্রমণে যাঁরা নাজেহাল বা ভুক্তভোগী একমাত্র তাঁরাই এর ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেন। অনেকক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকলেও অদৃশ্য অথচ অস্তিত্বমান এমন এক ধরনের মানসিক চাপের আবহাওয়ায় বিজ্ঞানীদের কাজ চালাতে হয় যে সমস্যার সমগ্রতা তুলে ধরার সুযোগ তাঁরা পান না। মস্তিষ্ক ও মনের এই দাসত্বের জন্য পরিবেশগত কারণ ছাড়াও আর এক অন্যতম কারণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের হীনম্মন্যতাবোধ আর আত্মবিশ্বাসহীনতা। ভারতীয় বিজ্ঞানের অন্যতম সুহৃদ জে. বি. এস হালডেন নানাভাবে, কখনও কখনও রূঢ়তার সাথেই, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই মর্যাদাবোধহীনতা সম্পর্কে আমাদের বার বার সচেতন করিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, প্রতিষ্ঠানগত স্তরে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মানসিকতার দিকটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সামগ্রিক সমস্যার একটা অংশ মাত্র [এই সমস্যাগুলোর একটা প্রাথমিক স্বচ্ছ আলোচনা পাওয়া যাবে (১) নং সূত্রে]। শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগত স্তরে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায় ম্যধ্যমিক ও জাতীয় স্তরে বিজ্ঞান ও কারিগরীর সংগঠন আর প্রয়োগের ওপর। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আবার এসে পড়ে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় সাধনের সাধারণ প্রশ্নটি, বিজ্ঞানের প্রয়োগের ওপর সমাজের গতিধারার প্রভাবের প্রশ্নটি। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করা ছাড়া বিশদতর আলোচনায় যাওয়ার অবকাশ নেই। সে কাজ বৃহত্তর যৌথ প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত।

বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মাধ্যমিক ও জাতীয় স্তর:

আগেই বলা হ'য়েছে, বৈজ্ঞানিক কাঠামোর দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্তরের কাজ হ'লো যথাক্রমে বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত প্রয়াসের সমন্বয় সাধন আর সেই প্রয়াসজাত ফলকে জাতীয় উৎপাদনে

ব্যবহার করা। সবদেশেই বিজ্ঞানচর্চার একটি অংশ ফলাফলের বিচারে থাকে দেশজ গণ্ডীর অতীত এবং তা জমা পড়ে বিশ্ববিজ্ঞানের ভাণ্ডারে। আধুনিক বিশ্বে এই অংশটার গুরুত্ব ক্রমশঃ বেড়ে চ'লেছে। কিন্তু এ ছাড়া বিজ্ঞানচর্চার অন্য অংশটা, গুরুত্বের বিচারে যা এখনও মুখ্য অবস্থানেই র'য়েছে, সেটা সরাসরি কাজ করে জাতীয় উৎপাদনের বিকাশের উপাদান হিসাবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'লো, সে বিকাশের অভিমুখ হবে কোন দিকে? সংকীর্ণ স্বার্থের হাতে নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের দিকে, নাকি সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে পরিচালিত অথচ বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনের দিকে? বহু-আলোচিত উৎপাদনী 'দক্ষতা'র (Efficiency of production) দিকে (যা হ'লো সম্পদকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার ক'রে মুনাফা অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গিরই নামান্তর; বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১৯৫৮ সালের প্রস্তাব আর ১৯৭৪-৭৯ সালের বিজ্ঞানবিষয়ক পরিকল্পনা, উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিকে বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম উপাদান বলা হ'য়েছে), 'দক্ষতা'র স্বার্থে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির ভিত্তিতে সংগঠিত-কেন্দ্রীভূত উৎপাদনের দিকে, নাকি এই 'দক্ষতা'র বদলে প্রতিটি মানুষের শ্রমের সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মারফৎ সংগঠিত ব্যাপক (broad-based) উৎপাদনী ব্যবস্থার দিকে? আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান, অর্থনীতি আর সমাজতন্ত্রের এ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মতো বিশাল জনবহুল অথচ অনগ্রসর দেশে এ প্রশ্নের প্রতি উদাসীন থেকে বিজ্ঞানের অগ্রসর ঘটানো অসম্ভব। তথাকথিত 'দক্ষতা'ই যদি চূড়ান্ত মাপকাঠি হয় তবে দেশের ব্যাপক জনসাধারণের প্রয়োজন ও ব্যবহারের প্রশ্নটি কখনও উৎপাদনের ভিত্তি হ'য়ে উঠতে পারবে না, কারণ দেশব্যাপী 'দক্ষ' উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো মূলধন শুধু আজ নয়, হয়তো আরো দীর্ঘদিন থাকবে ভারতবর্ষের ক্ষমতাবহির্ভূত। সেক্ষেত্রে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আরো দীর্ঘদিন প'ড়ে থাকবেন অবহেলিত প্রাচীন উৎপাদনব্যবস্থার কবলে। বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন, জীবনযাত্রা ও মানসিকতার সাথে পরিচয় ঘটবে না সাধারণ মানুষের। 'দক্ষ' উৎপাদনব্যবস্থার অগ্রগতি অব্যহত রাখতে মাঝে মাঝেই প্রয়োজন হবে বিদেশী অর্থ, বিদেশী বিজ্ঞান আর বিদেশী কারিগরী আমদানী; বিজ্ঞান হয়ে থাকবে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতিষ্ঠানসর্বস্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজনের নিরিখে উদ্দেশ্য-বিহীন। বিপরীতে, সাধারণ মানুষের শ্রম ও সৃজনীপক্তির সদ্ব্যবহার যদি উৎপাদনের অগ্রগতির মাপকাঠি হয়, তবে তথাকথিত 'দক্ষতা'য় হয়তো ঘাটতি পড়বে, 'উন্নত' উপকরণ ব্যবহার হয়তো ব্যাহত হবে, হয়তো ভাঁটা পড়বে বিজ্ঞাপনের চোখধাঁধানো বিস্ময়-সৃষ্টির ক্ষমতায়, কিন্তু বিনিময়ে বিজ্ঞান খুঁজে পাবে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য, মানুষের সাথে তার বাঞ্ছিত যোগাযোগ।

বিজ্ঞান আর কারিগরীচর্চার কাঠামোর দ্বিতীয়, অর্থাৎ মাধ্যমিক বা অন্তবর্তী স্তরটার ক্ষেত্রে যেখানে সারা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক গতিধারার ভূমিকা একটা দিকনির্দেশের মতো, এর তৃতীয় স্তরটার ক্ষেত্রে সেখানে এই গতিধারার ভূমিকা হ'লো একেবারে সরাসরি। এই স্তরে নির্ধারিত আর বাস্তবায়িত হ'চ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের ওপর আরোপিত গুরুত্বের ক্রমপর্য্যায়, বিদেশী 'সহযোগিতা'র ওপর নির্ভরশীলতা, ইত্যাদি। জাতীয় উৎপাদনের কত অংশ কোন্ খাতে বিনিয়োজিত হবে তা নির্ভর করে মূলতঃ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের ওপর—বিনিয়োগের উদ্দেশ্য আবার নির্ভর করে বিনিয়োগকারীর সামাজিক অবস্থান ও চরিত্রের ওপর। এর দ্বারাই নির্ধারিত হয় জাতীয় উৎপাদনের কত

জাতীয় প্রয়োজনে বিজ্ঞান

"বিদেশী শিক্ষা আর বিদেশী ধ্যানধারণার মোহ মনে হয় উন্নতি সম্পর্কে আমাদের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। উন্নতি বলতে আমরা মনে ক'রেছি শুধুই বিদ্যুৎশক্তি, সার, ইস্পাত, রেডিও, গাড়ী, টেলিভিশন····। স্বভাবতঃই এটা কার্যকর করা গিয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে; আর স্বভাবতঃই এর জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি সাহায্য আর সহযোগিতা চাইতে, কারণ, সোজা কথায়, ঐ ধরণের অর্থ বা কারিগরী আমাদের ছিল না।····

"স্পষ্টতঃই, আমাদের মতো বিশাল দেশে, যেখানে রয়েছে চরম দারিদ্র্য আর লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মহীনতা, যেখানে উন্নতি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী দাবী করে। আমাদের মূল প্রয়োজন পুঁজিবহুল, জটিল, কেন্দ্রীভূত শিল্প নয়, প্রয়োজন ব্যাপক বিকেন্দ্রীভূত, শ্রমবহুল ক্ষুদ্রশিল্প। আমাদের প্রয়োজন বিলাসদ্রব্য নয়, ব্যাপক ব্যবহারের সামগ্রী। আমাদের প্রধান প্রয়োজন উচ্চশিক্ষা নয়, বুনিয়াদি শিক্ষা আর প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ; প্রয়োজন সর্বাধুনিক বিদেশী ওষুধপত্র নয়, প্রয়োজন জনসাধারণের জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্যব্যবস্থা। সংক্ষেপে, উন্নতি বলতে আমাদের বুঝতে হবে সমগ্র দরিদ্র জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোর সংখ্যাতাত্ত্বিক বৃদ্ধি নয়।

"এই দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিজ্ঞানকে সামনে নিয়ে আসবে। সাহায্য আর সহযোগিতার প্রয়োজন দূর হবে আর স্বদেশী বিজ্ঞান ও কারিগরীর আশু প্রয়োজন দেখা দেবে, আগে যা ছিল না। বর্তমানে অনুপস্থিত এই প্রয়োজনই স্বদেশী বিজ্ঞানকে নতুন জীবন এনে দেবে। আর এরই ফলে আসবে অর্থনৈতিক উন্নতি, বাস্তবায়িত হবে বিজ্ঞানের অঙ্গীকার।"

সি. এস. আই. আর সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞান নীতি বিষয়ক প্রতিবেদন (জুলাই, ১৯৭৪)

শতাংশ ব্যয় হবে ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রয়োজনে আর কতটা হবে অপেক্ষাকৃত বিলাসবহুল ভোগ্যদ্রব্য সৃষ্টিতে; কতটা বিনিয়োজিত হবে উচ্চ মুনাফার মূলধনী খাতে, আর কতটাই বা হবে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে। এরই ওপর নির্ভর করে ব্যয়-বরাদ্দের কতটা অংশ যাবে সত্যিকারের বিজ্ঞানের উন্নতি আর প্রয়োগের কাজে আর কতটা যাবে 'প্রতিরক্ষা' তথা মারণাস্ত্র উৎপাদনের খাতে।

বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণায় ভারতবর্ষের মোট জাতীয় উৎপাদনের যে অংশ ব্যয়িত হয়, অন্যান্য দেশের সাথে তুলনামূলক বিচারে তা অতি নগণ্য—অর্থাৎ ভারতের স্থান সেখানে বেশ নীচের দিকে। অধিকতর দুঃখের বিষয় হলো এই যে সে বিনিয়োগের অনেকটাই হয় অপচয় আর তার একটা বড় অংশই আসে বিদেশী 'সাহায্যের' ভাণ্ডার থেকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ১৯৬১-৬২ সালের হিসাবে কৃষি-গবেষণার ৩২·৬৯%, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণার ৭২·৪১%, আবহাওয়া সংক্রান্ত গবেষণার ৩৩·৭২%, এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণার ১০·৩২% অর্থই ছিল বিদেশ থেকে পাওয়া [১]। আরও উল্লেখযোগ্য যে বিজ্ঞানচর্চায় বিনিয়োজিত অর্থের ক্ষেত্রে সম্প্রতি 'প্রতিরক্ষা' খাতে ব্যয়িত অর্থের মাত্রা ক্রমাগত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। ফলতঃ অন্য খাতে আপেক্ষিক ব্যয়ের ভাগ সামগ্রিক ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে বাড়তে তো পারছেই না, ক্ষেত্রবিশেষে হ্রাসপ্রাপ্তও হয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে বিজ্ঞান খাতে মোট কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের ৫·৪% ছিল প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে, আর ১৯৭০-৭১ সালে তা বৃদ্ধি পায় ১৩%এ, যার অর্থ হলো বারো বছরে প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি; অথচ বিজ্ঞানের অন্য কোনও বিভাগে বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগের অনুপাত হিসাবে কিন্তু আদৌ বৃদ্ধি পায় নি [২]। এই তথ্যগুলো এখানে কয়েকটা দৃষ্টান্ত হিসাবে দেওয়া হলো সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে বিজ্ঞান ও কারিগরীর প্রয়োগের ব্যাপারে পরিস্থিতিটা কি, সে বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জাতীয় উৎপাদনের কতটা অংশ কি ভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরীতে বিনিয়োগ হচ্ছে, সে বিনিয়োগ জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য অংশের ওপর কিভাবে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারছে তার ধারাবাহিক পর্য্যালোচনা বিজ্ঞানকর্মী তথা দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশেষ প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার উপযোগী তথ্য বর্তমানে আমাদের হাতে নেই। বিক্ষিপ্তভাবে যথেষ্ট তথ্য বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এগুলো সংগঠিত আকারে প্রকাশিত ও বিশ্লেষিত হবে।

জাতীয় উৎপাদনে বিজ্ঞান ও কারিগরীর প্রয়োগ বিষয়ে আর দুটো প্রসঙ্গের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের ইতি টানা যেতে পারে। প্রথমটি হ'লো ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী একচেটিয়া স্বার্থের অনুপ্রবেশ ও দেশজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি তথা প্রয়োগের ওপর এর কুপ্রভাব। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় শিল্পে আর কারিগরীতে বিদেশী প্রভাব নিয়ে এত আলোচনা, সরকারী স্তরে এত তর্কবিতর্ক, এত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সে সংক্রান্ত এত বিজ্ঞাপনের পরও কারিগরী আর যন্ত্রপাতিসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে বিদেশী প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে, এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে জাতীয় বিজ্ঞান পরিণতি লাভ করতে পারছে না (অর্থনীতি তথা বিজ্ঞানের বিকাশে বিদেশী প্রভাব নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে; নমুনা হিসাবে প্রাথমিক প্রাঞ্জল আলোচনার জন্য (১০), (১১), (১২) চিহ্নিত সূত্র দ্রষ্টব্য; অর্থনীতিগত আলোচনার জন্য নমুনা হিসাবে (১৩), (১৪) চিহ্নিত সূত্র দ্রষ্টব্য)। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এ বিষয়টিতে একটি সুদৃঢ় আদর্শগত অবস্থান প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হ'লো ভারতবর্ষের স্থবির কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তনে দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা বিজ্ঞানের ভূমিকার বিষয়ে। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় কৃষিতে কিছু পরিবর্তন দেখা গিয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এর বিজ্ঞানগত তথা অর্থনীতিগত ভিত্তি অনেকটাই বাইরের থেকে আমদানি করা[১৫]। ফলতঃ এই পরিবর্তন কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা ক'রলেও এর নানাবিধ অবাঞ্ছিত ফল ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এটা সকলেই স্বীকার করেন, ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রয়োগের সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র হ'লো ভারতীয় কৃষি, আর এই প্রয়োগই তরান্বিত ক'রবে ভারতীয় বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন। কিন্তু কেমন করে? এ বিষয়ে সরকারী স্তরে কিছু আলাপ-আলোচনা কথাবার্তার বেশী এখনও কিছু লক্ষ্য করা যায় নি। কিছু ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম ছাড়া বিজ্ঞানীদেরও এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। ভারতীয় অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকার এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিতে বিজ্ঞানীদের নিজেদের উদ্যোগে সংগঠিত প্রচেষ্টা আজ অবশ্যপ্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে।

উপসংহার:

বহু শতাব্দীর বিজ্ঞানসাধনার ঐতিহ্য সত্ত্বেও ভারতীয় বিজ্ঞান পড়ে রয়েছে আত্মসংশয় আর উদ্দেশ্যহীনতার কবলে। অথচ সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আভাস দিচ্ছে আগামী দিনে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনার। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে যে ধরণের প্রচেষ্টা প্রয়োজন, এদেশে বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের প্রচলিত প্রয়াসের সাথে তার ব্যবধান এখনও দুস্তর। অভিজ্ঞতা বলছে, এ ব্যবধান হয়তো বা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এ পরিস্থিতি বিজ্ঞান কর্মীদের কাছে দাবী ক'রছে হা-হুতাশ, তিক্ত হতাশা বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা, বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের ওপর যুক্তিনির্ভর আস্থা আর বলিষ্ঠ যৌথ উদ্যোগ।

সুব্রত ভট্টাচার্য
অভিজিৎ লাহিড়ী

সূত্রপঞ্জী ঃ

(১) এ. রহমান ঃ 'সায়েন্স টেকনলজি অ্যাণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট' (১৯৭৪)

(২) কেন্দ্রীয় সরকারের 'কমিটি অন সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজি' কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৬৯-৭০)

(৩) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'দি ফোর্থ প্ল্যান, মিড-টার্ম অ্যাপ্রেইজাল' ২য় খণ্ড (১৯৭১)

(৪) ডব্লিউ. মোরহাউস ঃ 'সায়েন্স ইন ইণ্ডিয়া' (১৯৭১)

(৫) ১৯৫৮ সালে লোকসভায় গৃহীত সায়েন্টিফিক পলিসি রেজলিউশন (সংখ্যা ১৩১/সি. এফ/৫৭) [(৪) নং সূত্রে উল্লিখিত]

(৬) ন্যাশনাল কমিটি অন সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজি (N C S T) ঃ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজি প্ল্যান, ১৯৭৪-৭৯, (২য় খণ্ড)

(৭) কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কর্তৃক প্রকাশিত দলিল 'সায়েন্স পলিসি ইন ইণ্ডিয়া' (১৯৬৭) দ্রষ্টব্য

(৮) এস. মালিক ও কে. ডি শর্মা ঃ ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

(৯) এ. রহমান ও অন্যান্য ঃ 'সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনলজি ইন ইণ্ডিয়া' ১৯৭৩

(১০) এ. কে. এন. রেড্ডি ঃ সায়েন্স টু-ডে, জানুয়ারী, ১৯৭৪

(১১) কে. আর. ভট্টাচার্য ঃ ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

(১২) কে. সি. খান্না ঃ ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়া ৯ই জুন, ১৯৭৪

(১৩) মাইকেল কিড্রন ঃ ফরেন ইনভেস্টমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৫

(১৪) এন. কে. চন্দ্র ঃ ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৮ম খণ্ড, সংখ্যা ৪-৭

(১৫) স্টীভ ওয়াইসম্যান (সম্পাদক) ঃ 'দি ট্রোজান হর্স—এ র‍্যাডিকাল লুক অ্যাট ফরেন এইড'—(১৯৭৪)।

ভারতবর্ষ ঃ জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাচিত্র

[দারিদ্র্য, ক্ষুধা, ব্যধি আর অপুষ্টির দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রতিবছর অগণিত মানুষ অপুষ্টিজনিত রোগ আর সংক্রামক ব্যধির কবলে প্রাণ হারান, হাজার-হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করে, অথবা চিরকালের মত দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আলোচ্য নিবন্ধে লেখক জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার এই দুরবস্থাকে নীতি প্রনয়ণে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতি বলেই চিহ্নিত করেছেন। নিবন্ধটি প্রসঙ্গে আলোচনা ও মতামতের আহ্বান জানাচ্ছি। —সম্পাদকমণ্ডলী]

"প্রতি বছর সারা দুনিয়ায় পাঁচ বছরের চেয়ে কম বয়সী দেড় কোটি শিশু অপুষ্টি আর সংক্রামক ব্যধির প্রকোপে প্রাণ হারায়। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বুই জনই হ'ল অনুন্নত দেশের শিশু"[১]—অনুন্নত দেশগুলোর সাধারণ মানুষের চরম স্বাস্থ্যহীনতার এটা একটা সূচক মাত্র। অন্যান্য সূচকগুলো, যেমন জনসাধারণের গড় আয়ু, শিশু মৃত্যুর হার, সংক্রামক ব্যধির দরুণ মৃত্যু, এগুলোও একইরকম মর্মন্তুদ ছবি তুলে ধরে। ভারতবর্ষের চিত্রও এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এমন কি অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায় ভারতের চেহারাটা আরও করুণ। আমাদের দেশে মানুষের গড় আয়ু ৪৯'২ বছর। এবং এদিক দিয়ে আমাদের দেশের অবস্থিতি দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নিম্নতম ধাপে।[২] সত্তর দশকের হিসেব অনুসারে ভারতবর্ষে মোট মৃত্যুর হার ও শিশু মৃত্যুর হার যথাক্রমে প্রতি হাজারে প্রায় ১৬'৩ ও ১৩৯ এবং এই অঙ্ক এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, জাপান, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদির মতো ভিন্নতর সমাজ ব্যবস্থা বিশিষ্ট উন্নত দেশের সাথে তুলনা করলে ভারতবর্ষের দুরবস্থা আরও প্রকট হয়ে উঠবে (নিচের তালিকায় দ্রষ্টব্য)।

নির্বাচিত কয়েকটি দেশের জনস্বাস্থ্যের তুলনামূলক অবস্থার তালিকা

দেশ	বছর	মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	গড় আয়ু
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র	১৯৭২	৮'৫	২৪'৭	৭০'০০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৬৩	৯'৬	২৫'২	৭০'০০
জাপান	১৯৭০-৭৫	৬'৬	১২'০	৭৩'০০
শ্রীলঙ্কা	১৯৭০-৭৫	৬'৩	৫০'০	৬৭'৮
মালয়েসিয়া	১৯৭০-৭৫	৯'৮	৩৮'০	৫৯'৪
চীন	১৯৭০-৭৫	১০'২	১৮'০	৬১'৬
ভারত	১৯৭০-৭৫	১৬'৩	১৩৯	৪৯'২

[সূত্র ১। পি, জ, কে, পানিকার ঃ "হেলথ্ কেয়ার ডেলিভারী সিস্টেম ঃ অল্টারনেটিভ এপ্রোচেস" ঃ ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইক্লি, ২৯শে মে, ১৯৭৬।

২। দি ইউ, এস, এস, আর ইন ফিগারস; ১৯৭৫ ঃ স্ট্যাটিস্টিকাল পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৬।]

ভারতবর্ষে প্রতি পাঁচ জন মায়ের মধ্যে চারজনই জন্মদানকালীন প্রাথমিক চিকিৎসা বা যত্নের সুযোগ পাননা। ম্যালেরিয়া দূর হয়েছে বলে সরকারী ঘোষণার পরেও এই ব্যধির পুনরাবৃত্তি দেখা দিচ্ছে; এই ব্যধি ১৯৭৫ সালে ছড়িয়ে পড়েছিল ৫১ লক্ষ লোকের মাঝে।[৩] সারা দুনিয়ায় এখনও কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয় যে দেশগুলোতে, ভারতবর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৭১ সালে ভারতবর্ষে যত লোক মারা গেছেন তার শতকরা পঞ্চাশজনই মৃত্যুবরণ করেছেন নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, যক্ষ্মা, বসন্ত, হাম, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডীফথিরিয়া, কলেরা অথবা আমাশয় ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে।[৪] এই গড় অঙ্কগুলো ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্যের দুরবস্থার সূচক হলেও সম্পূর্ণ অবস্থাটা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে না। এই গড় অঙ্কগুলো থেকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর শহর ও গ্রামের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের চিত্র পরিস্ফুট হয় না। দরিদ্ররা, বিশেষতঃ গ্রামের দরিদ্র মানুষেরাই, এই সমস্যার প্রধান শিকার। ভারতবর্ষে শহরের তুলনায় গ্রামে মোট মৃত্যুর হার ও শিশু মৃত্যুর হার দ্বিগুণ।

আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের এই করুণ অবস্থার কারণ কি? যে কারণগুলোর কথা সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে সেগুলি প্রথমে আলোচনা করা যাক:

(১) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বাজেটে স্বাস্থ্য নিতান্তই অবহেলিত একটি বিষয়। বিভিন্ন যোজনায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের পরিমাণ মর্মান্তিক ভাবে কম। প্রথম পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ছিল ১৪০ কোটি টাকা (পুরো ব্যয়ের ৫·৯৩ শতাংশ), দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২২৫ কোটি টাকা (মোট ব্যয়বরাদ্দের ৪·৯ শতাংশ), তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৪২ কোটি টাকা (ব্যয়-বরাদ্দের ৪·২ শতাংশ), চতুর্থ পরিকল্পনায় ১০৭৬ কোটি টাকা (ব্যয়-বরাদ্দের ৭·৫ শতাংশ) আর পঞ্চম পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়ায় স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টির জন্য একত্রে বরাদ্দ হয়েছে ১৩০০ কোটি টাকার মতন যা মোট বরাদ্দের শতকরা মাত্র ৩·২৫ ভাগ।[৫]

ভয়াবহ দারিদ্র্য আর অপুষ্টির দেশে স্বাস্থ্য খাতে এই ব্যয় নিতান্তই অপ্রতুল। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আর অগ্রাধিকারের প্রশ্নে এটা সরকারের বরাবরের ভুল দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় বহন করছে। পঞ্চম যোজনায় পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা আর পুষ্টির জন্য বরাদ্দ যেখানে ১৩০০ কোটি টাকা, সেখানে কেবল ১৯৭৬-৭৭ সালেই কেন্দ্র এবং রাজ্য-গুলোর পুলিশ খাতে মোট খরচ হল ৬৭৯ কোটি টাকার মত! আবার সম্পদের ঘাটতির জন্য যদি কখনও পরিকল্পনা ব্যয়ে ছাঁটাই করতে হয় তাহলেই কুঠারাঘাতটি নেমে আসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি ইত্যাদি খাতের উপর। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চম যোজনার খসড়া দলিলে ৩৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বহুল প্রচারিত ন্যূনতম চাহিদার কর্মসূচীর জন্য, যে কর্মসূচীর সাহায্যে গ্রামের গরীব মানুষের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, পুষ্টি ইত্যাদি ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলি পৌঁছে দেওয়া যাবে। পরবর্তীকালে পঞ্চম যোজনার চূড়ান্ত সংস্করণে সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য অনেকগুলি লক্ষ্যমাত্রাকেই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ন্যূনতম চাহিদার কর্মসূচীকে নামানো হয়েছে মাত্র ৮৮ কোটি টাকায়।

(২) প্রশিক্ষিত-জনশক্তির সংখ্যাল্পতা: দাবী করা হয়ে থাকে আমাদের দেশে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, নার্স ইত্যাদির সংখ্যাল্পতা বর্তমান। ১৯৭৪ সালে মেডিকেল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ায় রেজিষ্ট্রীকৃত ডাক্তারের সংখ্যা হল ১,৮৫,০৬৭ জন। এর থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে গড়ে প্রতি ৩৫০০ জনে একজন চিকিৎসক। ভারতবর্ষের ১০৫টি মেডিকেল কলেজ থেকে প্রতি বছর ১৩,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ডাক্তারী পাশ করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে নার্সের সংখ্যা ৮৮,০০০ আর ধাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক ৭০,০০০ জন। এই সংখ্যাগুলি উন্নত সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় অনেক কম হলেও অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় সন্তোষজনক বলে মনে হয়।[৬]

গ্রামের মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ ৫২৬৫টি কমিউনিটি উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত। প্রতিটি ব্লকে রয়েছে অন্ততঃ একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ছিল ৫৩২০টি, আর উপকেন্দ্র ছিল ৩৩,২৯১টি। ষাট থেকে আশি হাজার মানুষের চিকিৎসা একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতায় পড়ার কথা ভাবা হয়েছিল—কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং তার উপকেন্দ্রগুলো আশেপাশের জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জন্য কার্যকরীভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সক্ষম।

অনেক রাজ্যেই যখন মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ভয়াবহ বেকারী বর্তমান তখন দক্ষ জনশক্তির অভাবের সমস্যাটাকে একটু বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে এরকম মনে হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আরেকটা যে গুরুতর সমস্যা রয়েছে তা হ'ল শহরে এবং গ্রামে এই সমস্ত চিকিৎসকদের সুষম বণ্টন। অধিকাংশ চিকিৎসকই শহরে থাকতে চান। গ্রামে যেখানে জনসাধারণের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের বাস সেখানে কাজ করছেন চিকিৎসকদের মোট সংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসকের সংকট যে ভয়াবহ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এ ছাড়াও বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে চিকিৎসা শিক্ষার মান সাধারণভাবে অবনত। মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির ব্যবস্থা এবং মানের সমতা বজায় রাখার ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের অক্ষমতা, মেডিকেল কলেজগুলোতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব, কিছু বেসরকারী মেডিকেল কলেজে প্রচুর ফি নিয়ে ছাত্র ভর্তি করা—এগুলোকেই চিকিৎসাবিদ্যার মানের এই অবনতির কারণ হিসাবে ধরা হয়।

উপরোক্ত কারণগুলো অর্থাৎ সম্পদ এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবই কিন্তু সম্পূর্ণ চিত্র নয়। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত বিশ্লেষণে পরিমাণগত দিকটার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও স্বাধীনতার আগে বৃটিশ সরকার ও তার পরে এদেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির গুণগত দিকটা এখানে অনুপস্থিত। আসলে কিন্তু এই নীতিগুলোর মধ্যেই স্বাস্থ্য বিষয়ে ভারতবর্ষের এই নিদারুণ অবস্থার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। এমনকি পরিমাণগত দিকগুলো, অর্থাৎ সম্পদের অভাব এবং যথেষ্ট জনশক্তির অভাব, এগুলোও সরকারী নীতিরই সরাসরি বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বেরিয়ে আসবে।

ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য সমস্যার প্রকৃতি বনাম অনুসৃত নীতি ঃ

অন্যান্য সমস্ত অনুন্নত দেশের মতো ভারতবর্ষেও প্রধান ব্যাধিগুলোকে মূলতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা যায় : অপুষ্টিজনিত ব্যাধি আর সংক্রামক ব্যাধি। অনুন্নত দেশগুলিতে অসুস্থতা আর মৃত্যুর প্রধান কারণই হল অপুষ্টি আর সংক্রামক ব্যধি। এরই ফলে মোট মৃত্যুর হারের অর্দ্ধেকই আসে পাঁচ বছরের কম শিশুদের অকালমৃত্যু থেকে। অপুষ্টির সমস্যাটি অনুন্নত দেশগুলোতে অত্যন্ত ব্যাপক। প্রায়শঃই এটা মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে থাকে, বিশেষতঃ শিশুদের মধ্যে ; আর এ ছাড়াও অপুষ্টি থেকে দেখা দেয় প্রোটিন ও ক্যালরীর স্বল্পতাজনিত বিশেষ ধরনের কয়েকটা রোগ, যেমন কোয়াশিয়রকর, অতিশীর্ণতা (marasmus) ইত্যাদি। প্রাথমিক প্রতিরোধ শক্তি কমিয়ে দেয় বলে সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ারও অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল অপুষ্টি। আবার সংক্রামিত হওয়ার পরও অপ্রতুল আহার্যের ফলে সংক্রামিত ব্যক্তির বেঁচে থাকার ক্ষমতা অনেকাংশে কমে যায়।

সংক্রামক ব্যধিগুলিকে আমরা সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করে থাকি—অতিসার রোগ (diarrhoeal diseases), বায়ুবাহিত রোগ (air-borne), এবং বিভিন্ন ধরণের বাহক সঞ্চালিত রোগ (vector borne)। টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি অতিসার রোগ, যার ফলেই প্রধানতঃ অনুন্নত দেশগুলোতে শিশুরা প্রাণ হারায়, এগুলো উপযুক্ত স্যানিটারী ব্যবস্থা আর পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ছড়িয়ে পড়ে। গুটি বসন্ত, জল বসন্ত, যক্ষ্মা, ডীপথিরিয়া ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগগুলি বাসস্থানের অপ্রতুলতার দরুণ, জনসংখ্যার অত্যধিক ঘনত্ব আর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার দরুণ ছড়িয়ে পড়ে। ম্যালেরিয়া, অতিনিদ্রারোগ (sleeping sickness), ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বাহক সঞ্চালিত (vector-bone) রোগগুলি দেখা দেয় মশা বা একধরনের মাছির (tsetse flies) মাধ্যমে।

অনুন্নত দেশগুলোতে প্রধান প্রধান ব্যাধির প্রকৃতি থেকে স্পষ্টই যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হ'ল, স্বাস্থ্যের সমস্যা দারিদ্র্যের সমস্যার সাথে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। ভারতবর্ষসহ অনুন্নত দেশগুলোর স্বাস্থ্যসমস্যার মূল কারণই হল অপুষ্টি, অনুপযুক্ত স্যানিটারী ব্যবস্থা, পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, দূষিত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, আর অনুপযুক্ত ও অপ্রতুল বাসস্থান।

সাধারণ ধারণার বিপরীতে ম্যলেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, কুষ্ঠ, বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ মোটেই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য নয়—এই সমস্ত রোগগুলিই অতীতে পশ্চিম ইউরোপে মাথাচাড়া দিয়েছিল। অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রা, সাধারণ শিক্ষা আর স্যানিটারী ব্যবস্থা অর্থাৎ গৃহনির্মাণ, নর্দমা তৈরী, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি, এগুলির মান উন্নয়নের ফলেই এই রোগগুলি পশ্চিম ইউরোপ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

যদি দারিদ্র্যই স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয় তা হলে সমস্যাটির সমাধানের এক সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পুষ্টি, পরিশুদ্ধ পানীয় জল, যথোপযুক্ত আবাস, নর্দমা আর পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, ইত্যাদি সমস্যাকে স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের দেশে প্রধানত যে রোগগুলো দেখা যায় তাদের প্রকৃতি ও কারণগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, মশা, মাছি ও বিভিন্ন ধরনের কৃমি নিয়ন্ত্রণ—এই সব প্রতিষেধক (preventive) ব্যবস্থার ওপর আরোগ্য (curative) ব্যবস্থার থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। রক্তসঞ্চালনজনিত রোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি যে সব রোগের ফলে, উন্নত দেশগুলিতে শতকরা পঞ্চাশজন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন সে বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন—এইসব রোগের জন্য আরোগ্য ব্যবস্থার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভারতের মত অনুন্নত দেশে এটা মূল সমস্যা নয়।

আবার আরোগ্যপ্রধান ব্যবস্থায়ও দুটি পথ খোলা আছে। এক-দিকে গড়ে তোলা যেতে পারে দামী দামী সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট বড় হাসপাতাল যেখানে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করতে পারবেন ধনীরা। অথবা দামী যন্ত্রপাতি আর বিশেষজ্ঞ না থাকলেও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আর চিকিৎসক আছেন এমন সব হাসপাতাল সরকার বেশি সংখ্যায় গড়ে তুলতে পারেন, যাতে সংক্রামক ব্যধির মত সাধারণ রোগের চিকিৎসা বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে এটা খুবই পরিষ্কার যে অগণিত জনসাধারণের কল্যাণার্থে যদি স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয় তা হ'লে দ্বিতীয়টিই হ'ল সঠিক পথ।

কিন্তু তা হ'লে এতদিন পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সরকারের নীতিটি কি ছিল ? এ যাবৎ সমস্ত যোজনা দলিলগুলিতে এই বিষয়ে শুভ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হওয়া সত্বেও সরকারী ক্রিয়াকলাপগুলো ছিল আমাদের মত অনুন্নত দেশের প্রয়োজনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের নীতিই এখানে অনুসৃত হচ্ছে, যার প্রধান কথা হ'ল দক্ষ জনশক্তি, দামী যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে আরোগ্যভিত্তিক

চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এটা মূলতঃ শহরমুখী ও কেবল ধনীদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

অপুষ্টি দারিদ্র্যের আর এক নাম

প্রথমে অপুষ্টির কথা বিচার করা যাক। দারিদ্র্য দূর করার উচ্চাভিলাষ স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকেই সরকার পোষণ করে আসছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি কি? কয়েকটি চিত্র এর উত্তর আমাদের সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরবে। ১৯৫৮ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ এর পুষ্টি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির (Nutrition Advisory Committee) সুপারিশের ভিত্তিতে ষাটের দশকের প্রথম দিকে যোজনা কমিশন একটি কার্যকরী গ্রুপ গঠন করে, যাঁরা খাদ্য বাবদ গ্রামের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে মাথা পিছু ন্যূনতম প্রয়োজন ২০ টাকা এবং শহরের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে মাথাপিছু প্রয়োজন ২৫ টাকা (১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান অনুযায়ী) ধার্য করেন। ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানে গ্রামে মাথাপিছু প্রতি মাসে ২০ টাকা আর শহরে মাথাপিছু প্রতি মাসে ২৫ টাকাকে যদি দারিদ্র্য রেখা বলে ধরা হয়, তাহলে আমাদের দেশে কতজন 'দরিদ্র' মানুষ আছেন? দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস করেন এমন মানুষের সংখ্যা শতকরা হিসেবে বৃদ্ধি না হ্রাস পাচ্ছে এই নিয়ে যদিও বিতর্ক আছে তা হ'লেও প্রকাশিত তথ্যগুলি থেকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে যে, প্রতিবছরই দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পচ্ছে। হিসেব থেকে জানা যায়, ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানে গ্রামাঞ্চলে প্রতি মাসে মাথাপিছু ১৫ টাকা আয়ের নিচে যতজন মানুষ আছেন তাঁদের শতকরা সংখ্যা ১৯৬০-৬১ সালে ৩৮% থেকে বেড়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে দাঁড়ায় ৪৫%, আবার ১৯৬৭-৬৯ সালে তা দাঁড়ায় ৫৪% এ; আবার ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানে শহরাঞ্চলে প্রতি মাসে মাথাপিছু ১৮ টাকা আয়ের নিচে যত মানুষ আছেন তাঁদের শতকরা সংখ্যা ১৯৬০-৬১ সালে ৩২% থেকে বেড়ে ১৯৬৪-৬৫ সালে হয় ৩৭%, আবার তা থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে দাঁড়ায় ৪১%। এই চিত্র থেকেই আমরা বুঝতে পারি আমাদের দেশে অপুষ্টির ব্যাপকতা কী ভয়াবহ।

এই যদি দারিদ্র্য আর অপুষ্টির চেহারা হয় তা হলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্য বিষয়গুলির, বিশেষতঃ সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদির কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার : অবহেলিত জনস্বাস্থ্য

স্বাধীনতা-পূর্ব কালে (বৃটিশ) সরকারের স্বাস্থ্য নীতির বিবেচ্য ছিল প্রধানতঃ দুটি বিষয়ঃ

(১) ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা; এবং

(২) রেলপথ নির্মাণ, বাগিচা ইত্যাদিতে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষদের কর্মক্ষম রাখা।

এর জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল মূলতঃ সংখ্যালঘু শেতাঙ্গদের নিরাপত্তার জন্য আরোগ্যমূলক চিকিৎসাব্যবস্থা, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক বিশিষ্ট সুব্যবস্থাসম্পন্ন অতি অল্পসংখ্যক হাসপাতাল। ম্যালেরিয়া বিরোধী প্রয়াসের মত জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার প্রবর্তন করেছিল সেই সব অঞ্চলে যেগুলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ—যেমন বাগিচা এলাকাগুলোতে অথবা যে সব জায়গায় বৃটিশদেরই সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে পড়ার আশঙ্কা ছিল। এই ব্যবস্থাগুলি ছিল নেহাতই বিক্ষিপ্ত আর এগুলি সীমাবদ্ধ ছিল জনসাধারণের একটি ছোট্ট অংশের মধ্যে—মূলত শ্বেতকায় ও কিছু শ্রমজীবিদের মধ্যে। জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত, তারা প্রধানত নির্ভর করত দেশীয় ওষধির (traditional healer) ও কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রিশ্চিয়ান মিশনের ওপর, যাঁরা কয়েকটি গ্রামীণ এলাকায় হাসপাতাল খুলেছিলেন। কিন্তু এই মিশনারী হাসপাতালগুলির মূল জোরটা প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপর না থেকে ছিল আরোগ্যমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর।

স্বাধীনতা পরবর্তী স্বাস্থ্যনীতি

স্বাধীনতার পরেও দেশের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত স্বাস্থ্য নীতি প্রবর্তনে সরকারের পক্ষে কোন তোড়জোড় দেখা গেল না। পুরনো নীতিই অব্যাহত রইল; এই নীতির সুবিধাভোগী হ'ল নতুন শাসকেরা, মূলত শহরের ধনী সম্প্রদায়েরা। দক্ষ জনশক্তি এবং দামী যন্ত্রপাতির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল শহরমুখী আরোগ্যপ্রধান পুরনো চিকিৎসা ব্যবস্থাই বজায় রইল। এই ধরনের একটা নীতি চালিয়ে যাওয়ার পিছনে কারণগুলো কি ছিল? প্রথমতঃ, জনসাধারণের যে ক্ষমতাবান অংশটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের মত অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অপরিশুদ্ধ পানীয় জল, অপুষ্টি ইত্যাদি অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়না সে অংশের কাছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য ছিল।

কিন্তু কেন উন্নত পশ্চিমী দেশগুলির চাহিদার প্রয়োজনে বিকশিত এই পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের এখানে চলছে তার পেছনে এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমান। স্বাধীনতা উত্তর কালে ভারতীয় অর্থনীতি ভূতপূর্ব শাসকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেনি। পারে নি স্বাধীন জাতীয় বিকাশের পথে পরিচালিত হ'তে। বৃটেন এবং আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর আমাদের অর্থনীতি এখনও নির্ভরশীল এবং সময়ের সাথে এই নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধমান। স্বাধীন অর্থনীতির পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল এই অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই স্বাস্থ্যনীতিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ শুধু পুরনো ব্যবস্থার প্রচলনই নয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতাও বটে। হাসপাতাল, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, চিকিৎসা শিক্ষার প্রকৃতি ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যার সমস্ত দিকগুলির মধ্যেই এই নির্ভরশীলতা প্রতিফলিত। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবার মত দেশগুলি যারা সাম্রাজ্যবাদের থেকে

পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাদের স্বাস্থ্য নীতিতে যেখানে প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার দ্বারা অগণিত জনসাধারণের চিকিৎসার দাহিদা মেটানো সম্ভব সেখানে তুলনামূলক বিচারে আমাদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৮]

স্বাধীনতা উত্তর কালে সরকারের এই নীতি চালিয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতি কি হ'ল? প্রথমতঃ আমরা আগেই বলেছি শহুরে আরোগ্যপ্রধান, ব্যয়বহুল এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেবলমাত্র ধনীদের, বিশেষতঃ শহুরে ধনীদের, প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করেছে।

প্রচলিত চিকিৎসা শিক্ষা ঃ স্বাস্থ্য নীতির আর একটি ফলশ্রুতি

আমাদের চিকিৎসাশিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এই নীতির কি প্রভাব থাকতে পারে তা আলোচনা করা যাক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থার মডেল গ্রহণ করা মানেই হল পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও গ্রহণ করা। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের সময় থেকেই এই শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রবর্তিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসাবিদের অভাব পূরণ (ভারতবর্ষের হাসপাতালগুলিতে) আর পরাধীন অথচ কর্মদক্ষ শ্রমজীবি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা (ঔপনিবেশিক সরকারের প্রয়োজন মেটাতে ভারতীয়দের করণিকের বৃত্তিতে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বৃটিশ সরকারের সাধারণ শিক্ষানীতি এই স্বাস্থ্যনীতিতেও প্রতিফলিত)। ১৯৪৮ সালে বৃটেনে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা (National Health Serviee) প্রকল্প প্রবর্তিত হয় এবং বৃটেনে চিকিৎসকদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন ও প্রশিক্ষিত চিকিৎসকদের অভাব পূরণ করা হয়। এই সময় ভারতবর্ষের মত কমনওয়েলথের দেশগুলির মেডিকেল ডিগ্রী বৃটিশ মেডিকেল কাউন্সিল স্বীকৃতি দিতে শুরু করে। এই স্বীকৃতি দেওয়া হ'ত মেডিকেল কাউন্সিল দ্বারা পাঠ্যক্রম এবং মানের অনুমোদন সাপেক্ষে। এর অর্থ ই হ'ল বৃটেনে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল এদেশে তারই অনুরূপ পাঠ্যক্রম ও মান প্রবর্তন। এই অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের চাহিদা হ'ল দীর্ঘ ব্যয়বহুল শিক্ষা যা ভারতের মত অনুন্নত দেশগুলিতে জনসাধারণের অতি ক্ষুদ্র বিত্তবান অংশই বহন করতে পারে। কিন্তু এর চেয়েও ক্ষতিকারক দিকটা হ'ল ভারতের মত দেশে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন একটি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন। এখানে যেটা প্রয়োজন তা হ'ল অনেক বেশী সংখ্যায় চিকিৎসাবিদ যারা ওপরে উল্লিখিত প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাগুলোর যত্ন নিতে পারবে। কেন্দ্রীভূত বৃহৎ হাসপাতালগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার থেকে যে মেডিকেল গ্রাজুয়েটরা বেরিয়ে আসছেন তাঁদের শিক্ষা গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসার প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। এরা হয় শহরের হাসপাতালগুলিতে ভিড় করেন অথবা পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় পাড়ি দেন। এইভাবে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার অর্থ হ'ল আমাদের সম্পদের প্রচুর ক্ষতিসাধন। কেবলমাত্র বৃটেনেই ভারতের ১০,০০০ জন ডাক্তার রয়েছেন এবং একজন ডাক্তারের শিক্ষার জন্য বৃটেনে ব্যয় হয় ২৮,০০০ পাউণ্ড। প্রতি বছর ভারত থেকে ৩০০০ এরও বেশী ডাক্তার উচ্চশিক্ষা অথবা চাকুরির জন্য পাশ্চাত্যে পাড়ি দেন—এদের মধ্যে অনেকেই ফিরে আসেন না।[৯]

এই চিকিৎসা ব্যবস্থার আর একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক দিক হ'ল আমাদের দেশে বিদেশী ঔষধ কোম্পানীগুলির কার্যকলাপ। পাশ্চাত্যের চিকিৎসা মডেলের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই আরোগ্যপ্রধান ব্যবস্থা স্বভাবতঃ পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত ওষুধের উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য মডেলের অনুকরণে গড়ে ওঠা চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা আর প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ও উন্নতির ফলশ্রুতি হল পাশ্চাত্য ওষুধের উপর এই নির্ভরশীলতা। ভারতের ওষুধের বাজারে যাদের প্রাধান্য সেইসব বহুজাতিক সংস্থাগুলি চড়া দামে এই সব ওষুধ বিক্রি করে। একে ত' জনসাধারণের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশই এই চিকিৎসা-ব্যবস্থার আওতায় আসেন, তার ওপর আবার যদি কোন গরীব মানুষ কোনরকমে চিকিৎসকের কাছে পৌঁছতে পারেন তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেই দক্ষ ও সুশিক্ষিত চিকিৎসক তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন এমন এক ওষুধের দোকানে যেখানে এই গরীব মানুষটিকে চড়া দামে কিনতে হবে বহু বিজ্ঞাপিত এমন একটি ওষুধ, প্রতিকারক হিসেবে যার কার্যকারিতা হয়ত সন্দেহের অতীত নয়। মুনাফার স্বার্থের কাছে জনসাধারণের স্বাস্থ্যকে বলি দিতে এই কোম্পানীগুলো বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।[১০]

> বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ভবিষ্যদ্বানী ক'রছে যে ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া আবার ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এই সংস্থা অনুযায়ী এই দেশে আগামী দশকের শেষে ১·২ কোটি ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবেন এবং ঐ সময়ে প্রতি বছর চার লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। সবথেকে মারাত্মক—এর মধ্যে শতকরা ২৫টি ক্ষেত্রেই অতি বিপজ্জনক পি, ফেলসিপেরাম প্যারাসাইটের ফলে এমন ধরনের ম্যালেরিয়া দেখা দেবে যাতে মস্তিষ্কের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
>
> এই ভবিষ্যদ্বানী সত্যে পরিণত হোক বা নাই হোক এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতবর্ষে মহামারীর বর্তমান পর্য্যায়ে শিশুরাই সবথেকে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। ১৯৭০ সালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ৩১ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৪৭ জনই চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক। ১৯৭৫ সালে যে ৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে শিশুর সংখ্যাই ৪১ জন। উপরন্তু পি, ফেলসিপেরাম প্যারা সাইট বৃদ্ধির প্রবণতা অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে পারে।
>
> [সায়েন্স টুডে—মে, ১৯৭৭]

এ সবের অর্থ কি এই যে অগণিত জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে সরকারের কোনই শিরঃপীড়া নেই? তা নাও হ'তে পারে। স্বাধীনতা উত্তর কালে জনগণের বহু আশা আকাঙ্খা দেখা দিয়েছে ঃ

জনসাধারণ আশা করেন সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইত্যাদি ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবেন। এই সব মহলে জনসাধারণের চাহিদার প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু কর্মীও রয়েছেন। তাছাড়া অর্থনীতির বিকাশের জন্যও দরকার ছিল শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষম শ্রমজীবি গোষ্ঠীর। ফলে ষাটের দশকের প্রথমদিকে অনেকগুলি জনস্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করা হয়—এর মধ্যে সবথেকে প্রচারিত হল ম্যালেরিয়া দূরীকরণ প্রকল্প। কিন্তু এ ক্ষেত্রেই বা সত্যিকারের কাজ কতটা হয়েছে? ১৯৫৩ সালে DDT-র বহুল ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (NMCP) চালু করা হয় আর তাতে আশাপ্রদ ফলও পাওয়া যায়। ১৯৫৮ সালে আরও বড় স্কীমে জাতীয় ম্যালেরিয়া দূরীকরণ প্রকল্প (NMEP) গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমতে থাকে। এই সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল বছরে এক লক্ষ। তার পর থেকে কিন্তু ম্যালেরিয়া আবার বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সাল নাগাদ প্রতি বছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় বছরে ৫১ লক্ষ। কেন এই প্রকল্পগুলি ব্যর্থ হল? যে সমস্ত দেশ ম্যালেরিয়ার মত রোগ দূর করতে পেরেছে তাদের অভিজ্ঞতা হল, সংখ্যাগরিষ্ঠের বাসস্থানের পরিবেশ উন্নত করতে পারলেই কেবল এই সমস্ত রোগ দূর করা যায়। ভারতবর্ষে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অবনত হওয়া ছাড়াও এই NMCP, NMEP ইত্যাদি কর্মসূচী সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ভাবে সংগঠিত হয়েছিল। পরিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত বাসস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে DDT-র মত একটি মাত্র অস্ত্রের উপর ভরসা করে সংগঠিত কর্মসূচী একটি স্তরের পর ব্যর্থ প্রমাণিত হতে বাধ্য। নোংরা পরিবেশের জন্য মশার ডিপো তৈরী হচ্ছে, আর ক্রমেই তারা DDT-র বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠছে। এই ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কর্মসূচীর ব্যর্থতার জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দায়ী: ১৯৬৫ সালে যখন ম্যালেরিয়া দূরীকরণ একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ঠিক তখন পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর অগ্রগতিই হয়ে দাঁড়াল মৌলিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের মূল অঙ্গ। এর ফলে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ এবং অন্যান্য জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা অবহেলিত হল এবং বহুক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে বাতিলই হয়ে গেল। আর তার ভয়াবহ পরিণতি অচিরেই দেখা দিল।[১১]

ওপরের আলোচনা থেকে মোটামুটি যা বেরিয়ে আসে তা হল এই যে অনেক সদিচ্ছাপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ সত্ত্বেও একেবারে প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগসুবিধেগুলোও আজ পর্যন্ত রয়েছে সম্পূর্ণভাবে ধনীদেরই করায়ত্ত এবং তা হয়েছে প্রণীত নীতিগুলোর জন্যই, নীতি রূপায়ণের ব্যর্থতার জন্য নয়।

রচনা—কে .নাগরাজ
অনুবাদ—পার্থ সেন

সূত্র পঞ্জী :

১। সম্পাদকীয়, "দি হিন্দু", ১১ই এপ্রিল, ১৯৭৭।

২। পি, জি, কে, পানিকার: "হেলথ্ কেয়ার ডেলিভারী সিস্টেম ইন ইণ্ডিয়া: অল্টারনেটিভ এ্যাপ্রোচেস্": ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইক্‌লি, ২৯শে মে, ১৯৭৬।

৩। এস, পট্টনায়ক এবং ভি, পি, পাঠক: "হু লেট ম্যালেরিয়া ইন?": সায়েন্স টু ডে, মে, ১৯৭৭।

৪। পি, জি, কে, পানিকার: ঐ।

৫। বিভিন্ন যোজনা দলিল থেকে সংগৃহীত।

৬। ডি, ব্যানার্জী: "হেলথ্ সার্ভিসেস এ্যাণ্ড পপুলেশান পলিশিজ": ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইক্‌লি: স্পেশাল নং ১৯৭৬।

৭। পি বর্ধন (১৯৭০)—"অন দি ভিলেজ পুওর এ্যাণ্ড দি লেভেল অব সাবসিস্টেন্স" ইণ্ডিয়ান ইকনমিক রিভিউ: ভল্যু ৫, সংখ্যা ১।

৮। ডঃ জসুয়া হর্ন—"এ্যাওয়ে উইথ অল পেস্টস: এ্যান ইংলিশ সার্জেন ইন পিপলস্ চায়না ১৯৫৪-১৯৬৯" মান্থলী রিভিউ প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৯।

৯। লেস্‌লী ডয়াল এবং ইমোগেন পেনেল: "হেল্‌থ, মেডিসিন এ্যাণ্ড আণ্ডার ডেভেলপমেণ্ট": ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইক্‌লি, স্পেশাল নং ১৯৭৬।

১০। সঞ্জয় লাল: "মেজর ইস্যুস ইন ট্রান্সফার অব টেকনোলজি টু ডেভেলপিং কান্ট্রিজ-এ কেস স্টাডি অন দি ফার্মাসিউটিকাল ইণ্ডাস্ট্রী" (UNCTAD)।

"ফার্মাসিউটিকাল ইণ্ডাস্ট্রী: নো ড্রাগস ফর দি পুওর" ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইক্‌লি: ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।

১১। এন, পি সিন্‌হা: "ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন, হোয়াট ওয়েন্ট রং?" ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি: ২৬শে জুন, ১৯৭৬।

হরী ক্লেভার: "পলিটিকাল ইকনমি অব ম্যালেরিয়া ডি কন্‌ট্রোল" ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি, ৪ঠা মে, ১৯৭৬।

রিপোর্ট

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্মেলন

গত ১৫ই মে, ১৯৭৭ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বিজ্ঞান কর্মীদের এক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। সম্মেলনে সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিজ্ঞানকর্মীদের গত দু'বছরের কার্যাবলী উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন খাদ্য, প্রাথমিক শিক্ষা ও বাসস্থান এই তিনটি মৌলিক চাহিদা আমাদের দেশে আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও দেশে যে অসম বণ্টন ব্যবস্থা বজায় রয়েছে সদ্যস্বাধীন ভিয়েৎনামেও তা অনুপস্থিত। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের ফলাফল পৌঁছে দেওয়ার কাজে তিনি বিজ্ঞানকর্মীদের সচেতন ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং নবগঠিত সংস্থা ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সার্থক ভূমিকা পালন করবে এই আশা প্রকাশ করেন।

পূর্ববর্তী অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীহিরন্ময় সাহা সম্মেলনে বার্ষিক প্রতিবেদন (Report) পেশ করেন। প্রতিবেদনটিকে কয়েকটি অংশ ভাগ করা যায়—যেমন, বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা গঠনের ইতিহাস, সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—সংস্থার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ইত্যাদি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন-হাতে-গড়ে ওঠা বর্তমান সংগঠন পূর্বতন বহু অনুরূপ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতারই নতুন সংস্করণ। বিজ্ঞানের পেশাগত ও সামাজিক দিক সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলো আজ বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে পারস্পরিক মত বিনিময়, মতামত সংগঠন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ থেকেই সংস্থার প্রয়োজনানুভব ও তার সৃষ্টি। সংক্ষেপে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হ'ল : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জনকল্যাণ-মূলক ভূমিকার স্বপক্ষে ও গোষ্ঠিস্বার্থে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা, বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশঘটানো ও সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষসাধন, বিজ্ঞানকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাবৃদ্ধি ও মতৈক্যস্থাপন, বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে সংযোগ সেতুনির্মাণ প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক ও জনসম্পদপূর্ণ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানবিকাশের পথে মূল অন্তরায় কোথায়, স্বনির্ভরতার পরিবর্তে কেন ক্রমবর্ধমান বিদেশী সহযোগিতার ঝোঁক, বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি অবৈজ্ঞানিক অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার অস্তিত্বের কারণগুলো কি কি—এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য্য। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গুলিতে মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা বজায় রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সমস্যাটিও আজ অতি জটিল আকার ধারণ করেছে ও করছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা তার সীমিত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে এই উদ্দেশ্যগুলি রূপায়ণের পক্ষে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণে উদ্যোগী হবে বলে প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে অতি অঙ্কুরাবস্থায়ও গত দু'বছরে অঘোষিত এই সংস্থার উদ্যোগে কয়েকটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়েছে—যার দুটি বিজ্ঞান শিক্ষার ধারা সম্পর্কে, একটি 'ঔষধ সংক্রান্ত গবেষণা ও ভারতীয় শিল্প' সম্বন্ধে। তাছাড়া, 'আর্যভট্ট' সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় আলোচনা এবং নতুন পাঠ্যক্রমের ওপর সারাদিনব্যাপী সেমিনার ও সংগঠিত হয়েছে সংস্থার উদ্যোগে।

সম্মেলনে প্রতিবেদনের ওপর জীবন্ত আলোচনা হয়। শ্রীসজল রায় চৌধুরী লোকায়ত বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীমনীন্দ্র নারায়ন মজুমদার বিজ্ঞানকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে গ্রহণের এবং তা মানবিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরেন। প্রতি-বেদনের সমর্থনে বক্তব্য রেখে শ্রী টি. পি. ত্রিপাঠি বলেন যে বিজ্ঞান কর্মীদের স্বাধীনতার সুফলগুলি এবং বিজ্ঞানের বৈদেশিক নির্ভরতা ও বিভাজনীকরণ (compartmentalisation) ব্যবস্থার কুফলগুলি সম্পর্কে আজ অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা ও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সংস্থার গঠনতন্ত্র বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনসহ গঠনতন্ত্রটি শেষে সম্মেলনে গৃহীত হয়।

১৯৭৭-৭৮ সালের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যনির্বাহক কমিটির সদস্যরা

সম্মেলনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীজ্যোতি দত্ত সভাপতি ও শ্রীহিরন্ময় সাহা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভার কাজ পরিচালনা করেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ বি. পি. অধিকারী।

সম্মেলনে বিজ্ঞানকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃসর্ত মুক্তির দাবীতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তরুণ গবেষকের মৃত্যু

গত ৩রা জানুয়ারী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বিজ্ঞান গবেষক প্রগতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। কেন এবং কিভাবে অকালে এই তরুণ বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হ'ল সে সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে অনেকের, আমাদেরও।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রগতিবাবুর মায়ের একটি চিঠি ২৫শে জুন '৭৭ বেরিয়েছে। শ্রীযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ নন কারণ, মৃত্যুর অব্যবহিত আগে মায়ের কাছে লেখা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতে কোনরকম অস্থিরতা বা অস্বাভাবিকতার আভাস ছিল না। বায়োকেমিষ্ট্রীতে তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাঁর পি. এইচ. ডি. রেজিষ্ট্রেশন ছিল ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়াধীন। আপাতদৃষ্টে কোন স্পষ্ট কারণ খুঁজে না পেয়ে এবং অন্যান্য কিছু কারণে শ্রীযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ক'লকাতা ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্তের দাবী জানিয়েছিলেন কিন্তু দু' একটি বিরল সৌজন্যমূলক শোকবার্তা ছাড়া তিনি এ ব্যাপারে কোন কার্য্যকর সাড়া পাননি।

আমরা এই ঔদাসীন্যের নির্দ্বিধ নিন্দা করছি এবং রাজ্য সরকার সহ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে এই সন্দেহজনক মৃত্যুর তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।

নিয়মাবলী

- 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' দ্বিমাসিক পত্রিকা।
- 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সমস্ত উৎসাহী পাঠক-পাঠিকার কাছে, বিশেষ করে বিজ্ঞান কর্মীদের কাছ থেকে বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ, তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য আন্তরিক আবেদন করছে।
- শুধু বিষয়বস্তু নয়, রচনার প্রকাশভঙ্গীও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
- 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে আপনার মতামতের জন্য আবেদন করছি। এগুলি চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হবে।
- বিজ্ঞান কর্মীরা যে যেখানে আছেন সেখানকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তথ্যপূর্ণ, যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত রচনা পাঠান। এই সব রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- গবেষণাগার ও প্রতিষ্ঠানগুলির তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ পাঠান। সংবাদ ও পর্য্যালোচনা বিভাগকে সমৃদ্ধ করার জন্য আন্তরিক আবেদন করছি।
- সমস্ত ধরণের রচনাই কাগজের একপৃষ্ঠায়, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি।
- উপযুক্ত ডাকটিকিট সহকারে পাঠালে অমনোনীত রচনা, অমনোনীত হবার কারণ দেখিয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে।
- সম্পাদকীয় ছাড়া অন্য রচনাগুলিতে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব লেখকের।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

  'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী'
  পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা
  ৯৩/১ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,
  কলিকাতা-৯

আগামী সংখ্যার সম্ভাব্য সূচী

★ বিজ্ঞান কর্মীদের আন্দোলনের ইতিহাস।
★ বিজ্ঞান কর্মীদের বিশ্বসংস্থার ঘোষণা।
★ বিজ্ঞান কর্মীদের পদমর্য্যাদা সম্পর্কে ইউনেস্কোর ঘোষণা।
★ পুস্তক পরিচিতি।
★ নিয়মিত বিভাগ—সংবাদ।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার সম্পাদক হিরন্ময় সাহা কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।